কবির স্বদেশ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

'তিথিডোর' কি 'মৌলিনাথ'-এর অনিবারণীয় সম্মোহে দীক্ষিত প্রেমিকদের মুখে মুখে 'এই দুষ্টু হাওয়া নিয়ে কতো আর পারি' লাইনটা ঘুরে ঘুরে যাওয়ার সময় থেকেই ভিতরমহলের মানুষজন ইয়েট্‌সের ('What shall I do with this absurdity?) সঙ্গে নরেশ গুহের সাযুজ্য বিষয়ে অনেক দূর জেনে গিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এখানে কোনো নিবিড় প্রভাবের কথা উঠছে না, যেমন জীবনানন্দের ক্ষেত্রে। নরেশ গুহকে আমরা কি জীবনানন্দের জীবদ্দশায় তাঁর উপরে ইয়েট্‌সের এক-একটি মন্ত্রের ঐন্দ্রজালিক অভিঘাত নিয়ে দুর্ভাবিত হতে দেখিনি? বুদ্ধদেবের উত্তরসাধকের বরং অভিনিবেশ ছিল আইরিশ শব্দ জাদুকরের কবিপ্রতিভার খড় মাটি কাঠামোর দিকে, এবং সেই কারণেই তাঁর বক্ষ্যমাণ গবেষণা সন্দর্ভে তার সম্যক পরিচয় পেয়ে আমরা কৃতার্থ হই।

খুব সম্ভব রঙ্গনিপুণ নিমাই চট্টোপাধ্যায়ই এই মর্মে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একথা লিখেছিলেন : 'কবি শ্রী নরেশ গুহ / দুরন্ত এক দুপুরে ভাবেন / কবি যদি পলিটিক্সে নামেন / কে গড়বে তবে শিল্পের সুরা / রচবে রসের ব্যূহ?' জানি না, স্মৃতি থেকে অনবদ্য সেই স্যাটায়ার যথাযথ উদ্ধৃত করতে পারলাম কিনা, কিন্তু সঠিক জানি, তার বক্তব্যের অভিমুখিতা এটাই। নিমাই চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে ছিল কবির ১৯৩৬-এ প্রণীত সেই ঐতিহাসিক চিঠি : "Do not try to make a politician of me — I have not been silent; I have used the only vehicle, I possess — verse...it takes fifty years for a poet's weapon to influence the issue." যে অসীম স্বজ্ঞা থেকে তিনি এইসব কথা বলছেন তাকে এককথায় রাজনীতি বিরোধিতাও বলা যাবে না। বরং সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রথম দলরাজনীতির নির্লজ্জ অগভীরতা নিয়ে তীব্র বিরাগ ধ্বনিত হয়েছিল, একথা বললে তেমন অনৈতিহাসিক হয় না। এরই অনুসঙ্গে যখন তাঁকে লিখতে দেখি : "I find the infinite triviality of politics more trying than ever. We tear each other's character in pieces for things that don't matter to anybody", তাঁকে আজকের ভারতবর্ষের নিদারুণ পটভূমি থেকে দেখলে, মহাশ্চর্য এক ভাবিকথকের মতো মনে হয়, মাথা নিচু হয়ে আসে। আমরা জানি, এবং আমাদের এই সংস্কারগ্রস্ত ধারণা স্বয়ং ইয়েট্‌সেরও ছিল, যে মরতে মরতেও এখনও অমর্ত্য হয়ে রয়ে গেছে ভারত সভ্যতার বিয়োগফল, আর তাই তো আয়ার্ল্যান্ডের পৌরাণিক কোনো চরিত্রের চিত্রায়ণে তিনি অনায়াসেই ত্রিনয়নী দুর্গার মুখশ্রী এঁকে দিতে পেরেছেন, যার যুগসহ অথচ কালোত্তীর্ণ মহিমা নরেশ গুহের গবেষণাকাজের আশ্রয় স্থল।

অর্থাৎ, পলিটিক্স বলতে শুধু বিরোধীপক্ষের অবিবেকী মুণ্ডপাত নয়, বরং আবহমান দেশাত্মবোধের সময়োচিত উপস্থাপনা এবং প্রয়োগ বোঝায় এবং ইয়েট্‌সের পৃথ্বীসত্তা বা anima mundi এবং রবীন্দ্রনাথের 'যেখানে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা' স্বদেশের অপরূপ ভাবমূর্তনই দ্যোতিত হয়। এই উদার ছন্দে পরমানন্দে অতিষ্ঠিত হলে যুগ যুগ ধরে পরম্পরাবাহিত লোকনীতি ধানবোনা-নৌকা বাওয়ার গীতিপুঞ্জ একটি ভৌম অর্থে নির্ণীত একটি মৃত্তিকাখণ্ডের উপরে সকল নগ্নতা ঢেকে দেওয়া অমল বাস্তুর মতো কাজ করে। ইয়েট্‌স 'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকা লিখবার অনেক আগে থেকেই এই অমূল্য ধ্যানধারণার চর্যা করেছিলেন। এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও খিন্ন প্রাদেশিকতার অতিশায়ী এই উপলব্ধির প্রেক্ষিতে, আইরিশ ভারতীয় মানসিকতার একাত্মমুখী অন্তঃসাক্ষ্যে ও নরেশ গুহের W. B. Yeats : An Indian Approach এক অসামান্য উদ্যোগের উদাহরণ।

তাঁর এই কর্মযজ্ঞের পথপ্রদর্শক রিচার্ড এলমানকেও এই সূত্রে নন্দিত করতে হয়। কে না জানে, প্রদত্ত বিষয়ের ব্যাসার্ধে তিনি যে দ্বিতীয়রহিত! এই অদ্বিতীয়তার সৌজন্যেই তো তাঁকে তাঁর অ্যাকাডেমিক প্রতিপক্ষের পণ্ডিতেরা প্রতিমুহূর্তে নির্জিত করেছেন। যেমন, উদাহরণত, সদ্য উল্লেখিত দৃষ্টান্তেও কবির মধ্যে রাজনীতি এবং শিল্পের দোটানা লক্ষ করার দরুন হেলমুট ম্যালিঙ্গারের মতো বিশ্ববিদিত দক্ষ বিদগ্ধজনও কীরকম নিষ্ঠুর ভাষায় তাঁকে আক্রমণ করেছেন। এই সমস্ত ক্ষমাহীন চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও এলমান, সৃজনী সমালোচক আই. এ. রিচার্ডস্‌-এর সুযোগ্য উত্তরসূরি, কবিতার সপক্ষে অবিরত লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। সেদিক থেকে দেখলে তাঁকে আমরা একান্ত কবিদেরই মনঃপূত সমালোচক বলে শনাক্ত করতে পারি।

বোদলেয়ারের সময় থেকেই পুঁথিগত সমালোচকদের কবিতার মূল্যাঙ্কনের নিভৃত দেবায়তন থেকে চিরতরে নির্বাসিত করা হয়েছিল। এলমান তাঁর যাবতীয় লেখাপত্তরে কবিতার সেই অন্তর্নিহিত শর্তেই কথা বলে এসেছেন। নরেশ গুহ যখন আমেরিকার নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইয়েট্‌সের ভারত সন্ধান নিয়ে কাজ করতে গেলেন, আচার্য রিচার্ড এলমান তাঁর স্বপ্ন এষণার সমর্থনে উপনিষদ-বেদান্ত-পুরাণ এবং যোগশাস্ত্র নতুন করে অধ্যয়ন করেছিলেন, এই পবিত্র উদ্যম আমাদের দেশে অধুনাচর্চিত অবক্ষয়িষ্ণু গবেষণা নামাঙ্কিত লাঞ্ছনার ক্ষমাহীন পরিসরে প্রণম্য এক ব্যতিক্রম।

ব্যতিক্রম, নাকি ভারততত্ত্বের উন্মেষ ও উদ্বর্তনের ঐতিহ্য উজ্জ্বল ইতিহাসে আচ্ছন্নপ্রবাহ ধারাবাহিকতারই আরেকটি দীপ্যমান নিদর্শন? নরেশ গুহের প্রাঞ্জল অথচ কবিত্বমথিত উপস্থাপনা থেকে আমরা ঠাহর করে নিতে পারি, ইয়েট্‌স ও পুরোহিত স্বামী কিংবা রবীন্দ্রনাথের গূঢ় সম্পর্কের ইতিবৃত্ত আঁকতে গিয়ে তাঁকে অহরহ কতো গহন আর্কাইভ্‌সে তন্ন তন্ন করে হানা দিতে হয়েছে। এই পুনর্নব অন্বেষার প্রাক্কালেই তিনি জানতেন একজন উইলিয়াম জোন্‌সের মতো ইয়োরোপীয় ভাবুকের মধ্যবর্তিতা ছাড়া ভারতাত্মা শুধু প্রতীচ্যেই নয়, আমাদের এই আপনভোলা প্রাচ্যপ্রদেশেও অনধিগত থেকে যেত। তাঁরই তো মহিমায় 'শকুন্তলা' ল্যাটিন ভাষায় আশ্রিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ভারতপথিক গিয়র্গ ফস্টরের জার্মান সংস্করণে রূপান্তরিত হলো। সেই সংস্করণের সঙ্গে আকস্মিক পরিচয়ের সুবাদেই তো গ্যেয়েটের ইয়োরোকেন্দ্রিক অস্তিত্ব তছনছ হয়ে গেল, আর তারই দৌলতে ১৭৯১ নাগাদ, সেই মহাকবি, কী-এক মন্ত্রবলে, ভারতবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করে উঠতে পারলেন! ভাবতেও শিহর জাগে, তাঁর জায়মান জীবনী Wahrhait and Dichtung (সত্য এবং কবিতা)-এর প্রকল্প বিশ্বের উপযোগী করার জ্যোতির্ময় আগ্রহে 'সত্য' শব্দটি সংস্কৃতের মাধ্যমে আয়ত্ত করে নেওয়ার গরজে তখন রাতারাতি তিনি দেবনাগরী শিখে নিয়ে সত্যি-সত্যিই অপূর্ব ক্যালিগ্রাফিতে শব্দটি পাতার পর পাতা জুড়ে লিখতে থাকলেন। অভূতপূর্ব সেই উদ্দীপনের বিভাবেই জন্ম নিল ইন্ডোলজি, জার্মানিতেই।

গোটা ভারতবর্ষের নিরিখে বলা যায়, বুদ্ধদেব বসু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তুলনামূলক সাহিত্যের প্রথম শিলান্যাস করেন, বৈপ্লবিক সেই মুহূর্তে জার্মানি, ফরাসিদের এবং মার্কিন ভূখণ্ডে সেই ডিসিপ্লিন নিজ নিজ ইয়োরোপীয় প্রতীচীর দাবিদাওয়ার শামিল হিসেবেই বিদিত ছিল। নরেশ গুহ আমেরিকায় গিয়ে আমাদের হয়ে যখন এই থীসিস লিখলেন, তিনি নিজেও জানতেন না তিনি যে ওই বিদ্যাচর্চার একটি স্বয়ংনির্ভর ভারতীয় ঘরানা স্থাপন করছেন। ভাগ্যিস জানতেন না, তাই তো তাঁর গবেষণাকাজ লিরিকের মতো এত প্রাণবন্ত। এই ধারাতেই সাহস অর্জন করে নবনীতা দেব সেনও অতঃপর অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন।

ভাবতেই আত্মধিক্কার জাগে, এঁদের কাজকর্ম বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না, জানতে চাই না। তাই তো নরেশ গুহের এই অনন্য সৃষ্টি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৬৮) নামমাত্র প্রকাশিত হয়ে দীর্ঘকাল ছায়াচ্ছন্ন ছিল। কবিতার শুভার্থী গুণেন শীলের মহাত্ম্যে এই মহাগ্রন্থ বছর দুয়েক আগে আবার আলোর মুখ দেখল। কিন্তু তাহলে কার কী এসে যায়! আমাদের চিরাভ্যস্ত উদাসীনতার চক্রান্তে এ বইয়ের একটিও কপি লোকচক্ষে আদৌ কোনোদিন প্রতিভাত হবে কিনা, সে বিষয়ে আমার সংশয় অনপনেয়।

''নাচের আড়ালে লুকিয়ে কে ছায়ানট?'' গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : (৬ অক্টোবর, ১৯৩৩ - ১৭ নভেম্বর, ২০২০) গ্যেটে পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত এই সাহিত্যিক একজন বিশিষ্ট কবি এবং চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক।